রাতে বিশাল কিং সাইজের বিছানায় একাকী শুয়ে নিজেকে অসম্ভব অসহায় মনে হয় মিজানের। যদিও জুলেখার সাথে তার এখন পর্যন্ত শারীরিক কোন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় নি, তারপরও একই বিছানায় শুতে তার ভালোই লাগছিল। একটু দূর থেকে হলেও জুলেখার গন্ধ পাওয়া যেত, তার নড়া চড়া শোনা যেত, ঘুমের মধ্যে সে শিশুসুলভ বিড়বিড় করে, শুনতে ভালো লাগত। মাত্র দু'ঘর ওপাশে জুলেখা একাকী রাত্রি যাপন করছে, ব্যাপারটা তার কাছে অদ্ভুত মনে হচ্ছে। মাইককে নিয়ে এতো সমস্যার সৃষ্টি হবে সেটা সে ঘুনাক্ষরেও চিন্তা করে নি। ডাইনিং টেবিলে জুলেখার কথা মেনে নিলেই হত। মাইককে ছাড়া তার চলবে না কথাটা ঠিক নয়। পয়সা ঢাললে প্রচুর মানুষ পাওয়া যাবে। কিছু টাকা বাচানো বড় না জুলেখা বড়? নিজের মাথার চুল ছিড়তে ইচ্ছে হচ্ছে। যদিও পরে সে পরিস্থিতি সামলানোর চেষ্টা করেছে কিন্তু ততক্ষনে অনেক দেরী হয়ে গেছে। জুলেখার রাগ কতক্ষনে ভাঙবে কে জানে? ইতিমধ্যে রাগ করে সে কোন অযাচিত কিছু না করলেই হয়। যে টুকু সে দেখেছে, তাতে মনে হয় না তেমনটা হবার কোন সম্ভাবনা আছে। কিন্তু এই মেয়েটিকে তার এখন এত অপরিচিত মনে হচ্ছে যে নিশ্চিত করে কোন কিছুই ভাবতে পারছে না।

নাইট লাইটটা পরিবর্তন করতে ভুলে গেছে মিজান। আর আছে কিনা সে নিশ্চিত নয়। নতুন একটা কিনতে হবে। বাইরে আজ অন্ধকার। ঘরের মধ্যেও অন্ধকার। অস্বস্তি নিয়ে বিছানায় লেপের ভেতরে ঢুকে ঘুমানোর চেষ্টা করল মিজান। আলো অন্ধকার নিয়ে সে সাধারণত রাতে মাথা ঘামায় না, যেহেতু বিছানায় যাওয়া মাত্রই তার ঘুম চলে আসে। আজ কিছুতেই এলো না। এপাশ ওপাশ করতে করতে আর্ধেক রাত পার করে দিয়ে কোন এক সময় দু'চোখের পাতা বোধহয় বুজে এসেছিল, হঠাৎ খস খস শব্দে সজাগ হয়ে গেল। কাত হয়ে শুয়ে ছিল সে, নড়ল না। নিঃসাড়ে শুয়ে থেকে কান খাড়া করে চারদিকের শব্দ শোনার চেষ্টা করল। কাঠের বাড়ীতে রাতে স্বাভাবিকভাবেই নানান ধরণের সংকোচন প্রসারনের শব্দ হয়। অস্বাভাবিক কিছু কানে এলো না। ধীরে ধীরে দু'চোখের পাতা খুলল মিজান, অন্ধকারে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকতে দৃষ্টি কিছুটা পরিষ্কার হল। চোখের কোণ দিয়ে বিছানার পাশে কিছু একটা দেখল সে। কেউ কি দাঁড়িয়ে আছে? জুলেখা? তাকাবে? জুলেখা যদি লুকিয়ে লুকিয়ে এসে থাকে তাহলে তাকানোটা কি ঠিক হবে? বুকের মধ্যে হৃতপিন্ডটা ঢুকুর ঢুকুর করছে। লেপের নীচে ঘেমে গেছে সে। কিন্তু ঘাড় ঘুরিয়ে তাকানোর সাহস হল না। কয়েকটা নীরব মুহূর্ত পেরিয়ে গেল। খুব ধীরে ধীরে, ছায়ার মত তার চোখের কোণ থেকে অন্ধকার অবয়বটা নিঃশব্দে দরজার দিকে সরে গেল। কান খাড়া করে মনযোগ দিয়ে পদশব্দ শোনার চেষ্টা করল মিজান, খুব ম্লান পাতা ওল্টানোর মত একটা শব্দ শুনতে পেল। কয়েকটা দীর্ঘ মুহূর্তের পর আবার সব চুপচাপ হয়ে এলো। খুব ধীরে ধীরে দরজার দিকে ঘাড় ঘোরাল ও। ভয় হচ্ছিল হয়ত তাকাতেই দেখবে জুলেখা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে। তার ধারনা মিথ্যে প্রমাণিত হল। কোথাও কেউ নেই, শুধু দলা বাঁধা অন্ধকার।

পরদিন ভোরে ফযরের নামাজ পড়তে উঠল মিজান। সে আশা করেছিল জুলেখার সাথে দেখা হবে। সে যে কামরায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে সেটার সাথে লাগোয়া কোন বাথরুম নেই। যার অর্থ অজু করতে হলে জুলেখাকে ঘর থেকে বের হতেই হবে। নামাজ পড়ে কিছুক্ষন উপরের করিডোরে হাঁটাহাঁটি করল মিজান। জুলেখার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে তাকে ডাকতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত পাল্টাল। হয়ত শরীরটা ভালো নেই। ঘুমাচ্ছে। আরোও পরে ডাকলে হবে। সব ঠিক ঠাক আছে কিনা জানাটা তার কর্তব্য। সে নীচে রান্নাঘরে গিয়ে এক কাপ চা খেল। তার মনের অস্থিরতা ক্রমাগত বাড়ছে। মাত্র দু' দিনের ব্যবধানে জুলেখাকে নিয়ে এতোখানি উদ্বেগের সৃষ্টি হবে এটা সে ঘুমাক্ষরেও ভাবেনি। একবার ভাবল রহমতকে ফোন করে আলাপ করে। কিন্তু রহমত ব্যাটা ঘুমাতে যায় ভোরের দিকে, ওঠে কখন কে জানে? কাজকর্ম না থাকলে হয়ত সারাদিন বিছানাতেই কাটিয়ে দেয়। বউ চলে যাবার পর তার আর কোন রুটিন-ফুটিন নেই। বাইরে থেকে দেখে মনে হয় খুব সুখে আছে। ঘুরছে, ফিরছে, খাচ্ছে-দাচ্ছে, বাসার মধ্যে এবং বাইরে জঙ্গল বানিয়ে ফেলেছে। কিন্তু মিজান জানে রহমত নিঃসঙ্গতায় ভোগে। ব্যবসার কাজে যতক্ষন ব্যাস্ত থাকে ততক্ষন ভালো থাকে। বউ থাকতে সে যেরকম রুটিন করে রাজ্যের পার্টি আর অনুষ্ঠানে যেত, এখন তার একাংশও করে না। যেন স্ত্রী থাকতে তাকে উত্যক্ত করবার জন্যই সে যাবতীয় উল্টো-পাল্টা কাজগুলো করত। সে চলে যাবার পর তার আর কোন আগ্রহ নেই। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ে মিজান। রহমতের অবস্থা দেখেই সে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল আবার বিয়ে করার। এখন তাকে সেই জন্য মাসুল দিতে হবে।

নয়টার দিকে রহমত নিজেই ফোন করল। "খবর আছে।"

মিজান অবাক হয়েছে। ছুটির দিনে রহমত এতো সকালে ঘুম থেকে উঠে পড়েছে এটা স্বাভাবিক নয়। নিশ্চয় গুরুত্বপূর্ণ কিছু হয়েছে। উপরে জুলেখা এখনও তার কামরা থেকে বের হয়নি। কান খাড়া করেও সেই কামরা থেকে কোন শব্দ-টব্দ আসতে শুনছে না সে। এতো দেরী করে কখন ওঠে না জুলেখা। নিশ্চিত হবার জন্য উঁকি দিয়ে দেখল জুলেখার ঘরের দরজা বন্ধ আছে কিনা। তারপর নীচে লিভিংরুমের পাশে তার ছোট্ট রিডিং রুমে ঢুকে দরজা ভিড়িয়ে দিল। রহমতের সাথে তার আলাপ জুলেখার কানে গেলে প্রতিক্রিয়া কি হবে বোঝা দুষ্কর, কিন্তু খুব প্রীতিকর হবার কথা নয়।

একটা চেয়ারে বসে গলা নামিয়ে বলল, "বল। জুলেখা এখনও ঘুমাচ্ছে।"

"ব্যাটা দৌলতের খবর পাওয়া গেছে," রহমতের কণ্ঠে কিঞ্চিৎ দম্ভ। "আমি কাউকে খুঁজে পাবো না এটা কখন হতে পারে? কাল রাতেই খবর পেয়ে গেছিলাম। তুই আবার সকাল সকাল শুয়ে পড়িস দেখে রিং দেই নি।"

"ভদ্রলোক কোথায় এখন?"

"লন্ডন, ওন্টারিও। ঠিকানা পেয়েছি। ফোন নাম্বারে কল দিয়েছিলাম, ভয়েস মেইলে চলে যাচ্ছে। বার তিনেক চেষ্টা করেছি সকাল থেকে। ধরে না।"

"হয়ত ঘুমাচ্ছে এখন। মাত্র তো নয়টা বাজে।"

"শোন, দৌলত মিয়া ভোর পাঁচটায় উঠে যোগ ব্যায়াম করে। আমি তাকে খুব ভালো মত চিনি। ইচ্ছে করে ফোন ধরছে না। হলফ করে বলতে পারি তোকে।"

"ফোন না ধরার কি কারণ থাকতে পারে?" মিজান চিন্তিত ভাবে বলল।

"আমি কি করে বলব? কিন্তু হতে পারে জুলেখা ভাবী সম্বন্ধে সে হয়ত সত্যি সত্যিই কিছু জানে। আমি ফোন করছি বোঝা মাত্র কিছু একটা আন্দাজ করে নিয়েছে।"
মিজান একটু ভেবে বলল, "আমি একবার চেষ্টা করব?"
"লাভ হবে না। এই ব্যাটা মনে হচ্ছে পিছলা। আমি কি বলি জানিস, আজ তো তোর অফিস নেই। চল, একেবারে লন্ডনে তার বাড়ীতে গিয়ে ঠেলে উঠি। মাত্র তো ঘন্টা দুই-আড়াইয়ের ড্রাইভ। সুযোগ দিলে হয়ত আর পরে ধরা যাবে না। এখন তোর সিদ্ধান্ত। আমি ফ্রি আছি।"
"তোর কি মনে হয় সে সাহায্য করতে পারবে?" মিজান দ্বিধা দ্বন্দ্ব নিয়ে বলল।
"সাহায্য করতে পারুক না পারুক কিছু যে জানে সেই ব্যাপারে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই," জোর দিয়ে বলল রহমত। "প্রথমত, এই এলাকা থেকে ভেগেছে। তারপর ফোন করছি, ধরছে না। আলামত ভালো না। খামাখা সময় নষ্ট না করে চল এখুনিই বেরিয়ে পড়ি। তুই তৈরি হ, আমি তোকে বিশ মিনিটের মধ্যে তুলে নিচ্ছি।"
মাথা নাড়ল মিজান। "না, না। জুলেখা কিছু একটা সন্দেহ করে বসতে পারে। আমিই তোর ওখানে আসছি। তুই রেডী হয়ে থাক।"
"কাল রাত থেকে রেডী হয়ে আছি। তাড়াতাড়ি আয়। একটু রোমাঞ্চ রোমাঞ্চ লাগছে।"
"তুই একটা পাগল!"
হা হা করে হাসল রহমত। "যলদি আয়।"

তারা লন্ডনে যখন পৌঁছাল তখন প্রায় মাঝ দুপুর। দৌলত মিয়ার মাঝারী সাইজের এক তলা বাড়ীটা শহরের পশ্চিম দিকে, একটু খোলামেলা জায়গায়। খুঁজে পেতে খুব একটা সমস্যা হল না। বাড়ির সামনে গাড়ী রাখল। কলিং বেল বাজাল। ভেতর থেকে কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। ড্রাইভওয়েতে একটা মিনিভ্যান পার্ক করা। বাসার চারদিক দেখে মনে হচ্ছে সেখানে মানুষজন বাস করছে না। প্রায় মিনিট পাঁচেক ধরে বেল টেপার পরও যখন দরজা খুলল না তখন বিরক্ত হয়ে পাশের বাসায় গিয়ে বেল বাজাল রহমত। একজন শ্বেতাঙ্গ, বয়েসী মহিলা বেরিয়ে এল। তাকে জিজ্ঞেস করতে সে জানাল, দৌলত মিয়াকে সে আগের দিন সন্ধ্যাতেই দেখেছে। গাড়ীটা তারই। তাদের অন্য কোন গাড়ী আছে বলে তার জানা নেই। সে তার স্ত্রীকে নিয়ে থাকে। তাদের একটি ছেলে আছে। ইউনিভার্সিটি যায়। সে বোধহয় অন্য কোথাও থাকে কারণ মহিলা তাকে বেশ কিছুদিন দেখে নি।
তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আবার দৌলত মিয়ার দরজার সামনে ফিরে এল ওরা। কলিং বেল না বাজিয়ে এবার ফোন করল রহমত। ভয়েস মেইলে গেল। "দৌলত সাহেব, আপনার সাথে দেখা না করে আমরা এখান থেকে যাচ্ছি না। আর মিনিট পাচেকের মধ্যে যদি দরজা না খোলেন তাহলে আমি পুলিশে খবর দেব। কে জানে আপনারা হয়ত অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। জরুরী চিকিৎসা দরকার। তারা এসে দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকবে..."
তার মেসেজ রাখা শেষ হবার আগেই দরজা খুলে গেল। দৌলত মিয়ার স্ত্রী হবে। মাঝ বয়েসী মহিলা, সুতীর শাড়ী পরনে, ঘোমটা দিয়ে মাথা ঢাকা। "ও তো বাসায় নাই। আমেরিকা গেছে অফিসের কাজে।"

রহমত কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, মিজান তাকে থামিয়ে নরম গলায় বলল, "ভাবী, আমার নাম মোহাম্মদ মিজান। দৌলত ভাই আমার একটা বিরাট উপকার করেছিলেন। আমার স্ত্রী ক্যান্সারে মারা যাবার পর আমি ভয়ানক একাকীত্বে ভুগছিলাম। একজন সঙ্গীনির খোঁজ করছিলাম। দৌলত ভাই একটি মেয়ের খোঁজ এনেছিলেন। আমি তাকে বিয়ে করে কানাডা নিয়ে এসেছি। আমি আপনাদেরকে আমার গরীবখানায় একটু আমন্ত্রণ জানাতে চাই।"

ভদ্রমহিলা অস্বস্তি নিয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে তার শেষ কথাটা আদৌ বিশ্বাস করে নি। "ও তো নেই এখানে। আপনারা না হয় পরে ফোন করেন। দুই তিন সপ্তাহর মধ্যে চলে আসবে।"

রহমত এই পর্যায়ে একটা অভিনব কাজ করে বসল। সে মাথা চেপে ধরে কাতর কণ্ঠে বলল, "উফ, মাথাটা হঠাৎ করে কেমন দুলে উঠল। আমার ডায়াবেটিস আছে। একটু বসতে হবে ভাবী। একটু জায়গা দেন..."

সে ভদ্রমহিলাকে একরকম সরিয়ে দিয়ে টলমল পায়ে ভেতরে ঢুকে লিভিংরুমের দিকে হাঁটতে শুরু করল। ভদ্রমহিলা আতঙ্কিত কণ্ঠে চীৎকার করে উঠল, "কোথায় যাচ্ছেন আপনি? একি? দৌলত! দৌলত!"

প্রায় তৎক্ষণাৎ কাঁচাপাকা দাড়িধারী একজন মাঝারী উচ্চতার লোক বাড়ীর অন্য পাশ থেকে দ্রুত পায়ে এগিয়ে এলো। তার পরনে লুঙ্গী, গায়ে পাঞ্জাবী, চোখে চশমা। রহমত তাকে দেখেই হৈ চৈ করে উঠল, "আরে দৌলত সাহেব! কত দিন পর দেখা হল। কেমন আছেন? সব ভালো তো?"

দৌলত থেমে গম্ভীর মুখে তার দিকে কিছুক্ষন তাকিয়ে থেকে মিজানের দিকে ফিরল। "আরিফা, ওনাকে ঢুকতে দাও। দরজাটা বন্ধ করে দাও। আপনারা আসুন আমার সাথে। লিভিংরুমে গিয়ে বসি।"